শিক্ষাখাত ও পিআরএসপি

শিক্ষাকে কিভাবে দারিদ্র্য হ্রাসের অন্যতম কৌশল হিসেবে ব্যবহার করা হবে তার কোনো দিক-নির্দেশনা নেই আই-পিআরএসপি দলিলে। পিআরএসপিতে এসব সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হবে কী?... বিশ্লেষণ করেছেন **আসজাদুল কিবরিয়া**

দারিদ্র্য হ্রাসে শিক্ষার ভূমিকা অনস্বীকার্য ধরে নেয়া হয়েছে বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও। একই সঙ্গে এটাও বলা হয়েছে যে শিক্ষা বিস্তারে তথা জনসাধারণকে সাক্ষর ও শিক্ষিত করে তুলতে রাষ্ট্রের একটা বড় দায়িত্ব রয়েছে। বাংলাদেশের সংবিধানেই এ বিষয়ে খুব সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা রয়েছে। বস্তুত বাংলাদেশের সংবিধানে দেশের প্রত্যেক মানুষের জন্য শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে। সংবিধানের ১৫ অনুচ্ছেদে অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ জীবনধারনের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা করার জন্য রাষ্ট্রকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। সংবিধানের ১৭ অনুচ্ছেদে রাষ্ট্রকে একই পদ্ধতির গণমুখী ও সার্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সকল বালক - বালিকাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। একই সঙ্গে এও বলা হয়েছে যে সমাজের প্রয়োজনের সঙ্গে শিক্ষাকে সঙ্গতিপূর্ণ করতে এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করতে রাষ্ট্র বাধ্য। বাংলাদেশ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক শিক্ষা সনদসমূহে স্বাক্ষর করার মাধ্যমে শিক্ষা অধিকার বাস্তবায়নের জন্য রাষ্ট্রীয় দায়বদ্ধতাকে বারবার স্বীকৃতি দিয়েছে। জাতীয়ভাবে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইন পাস করানো হয়েছে। শিক্ষানীতি, জাতীয় শিশু অধিকার নীতি, জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিসহ একাধিক নীতিমালায় সবার জন্য শিক্ষা অধিকার বাস্তবায়নের অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়েছে। মোটকথা শিক্ষার অধিকার দেশের প্রতিটি মানুষের আইনগত বৈধ মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃত। এ স্বীকৃতি থাকার পরও বারবার বিভিন্নভাবে দেশের বিপুলসংখ্যক জনগোষ্ঠী এ অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে আসছে। বিভিন্নভাবে লংঘিত হচ্ছে শিক্ষার অধিকার। আর এই অধিকার লংঘনের একটি বড় দিক হলো শিক্ষাখাতে রাষ্ট্রীয় অর্থায়নের অপ্রতুলতা। দেশের বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠীর প্রয়োজনের তুলনায় সরকারি কোষাগার থেকে যে অর্থ ব্যয় করা হয় তা যথেষ্ট নয় মোটেও। তাছাড়া এই অর্থ ব্যয়ে অদক্ষতা ও দুর্নীতির কারণে শেষ পর্যন্ত তা আর যাদের কাছে যাওয়ার কথা তাদের কাছে ঠিকমতো যেয়ে পৌঁছে না।

গরীব মানুষের কাছে শিক্ষার আলো পৌঁছানোর চেষ্টা ব্যর্থ হচ্ছে বিভিন্ন কারণে। গরীব জনগোষ্ঠীর ২৫%-এর কম মৌলিক শিক্ষায় সরকারি ব্যয়ের অংশ ছাড় করাতে পারে। মাত্র ১.৫% দরিদ্র মানুষ উচ্চশিক্ষাখাতে সরকারি বরাদ্দের সুবিধা পায়। বিনামূল্যে প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা থাকলেও শিক্ষাখাতে দুর্নীতির কারণে ৪১% অভিভাবককে বিভিন্ন উপলক্ষ্যে স্কুল কর্তৃপক্ষকে টাকা-পয়সা দিতে হয়। একইভাবে শিক্ষাখাতে যেসব বিদেশী সাহায্য আসে তার অনেকটাই চলে যায় মুষ্টিমেয় শ্রেণী-গোষ্ঠীর পকেটে। ফলে শিক্ষার মাধ্যমে মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্য বহুলাংশে ব্যর্থ হচ্ছে। আর এই ব্যর্থতা বাধাগ্রস্ত করছে দারিদ্র্য হ্রাসের কার্যক্রমকে। ইউএনডিপির সর্বশেষ প্রতিবেদন অনুসারে বয়স্ক শিক্ষায় বাংলাদেশ এখনো দক্ষিণ এশিয়ার সবার নিচে। ২০০২ সালের তথ্য অনুসারে, বাংলাদেশে ১৫ বছর বা তার বেশি বয়সের মানুষের মাত্র শতকরা ৪১ দশমিক ১ ভাগের স্বাক্ষর জ্ঞান আছে। অথচ মালদ্বীপে এই হার ৯৭.২%, শ্রীলংকাতে ৯২.১%, ভারতে ৬১.৩%, ভূটানে ৪৭%, নেপালে ৪৪% এবং পাকিস্তানে ৪১.৫%। আবার শিক্ষাখাতকে বেসরকারিকরণের নামে সামাজিক বৈষম্য বাড়িয়ে তোলা হচ্ছে। আয়-বৈষম্য বেড়ে চলার কারণে দারিদ্র্য হ্রাসের প্রচেষ্টাও চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়ে পড়েছে।

আই-পিআরএসপি ও শিক্ষাখাত

দাতাগোষ্ঠীর পরামর্শে প্রণীত অন্তর্বর্তীকালীন দারিদ্র হ্রাসের কৌশলপত্র (আই-পিআরএসপি) শিক্ষাগত বঞ্চনাকে দেশের দারিদ্র অবস্থার অন্যতম

উপাদানহিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে এবং শিক্ষাখাতের বিরাজমান কিছু প্রধান সমস্যা চিহ্নিত করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে যে শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে অকালে ঝরে পড়ার সমস্যা উদ্বেগজনক, বিশেষত চরম দারিদ্র্যর ক্ষেত্রে। আই-পিআরএসপি দলিলে শিক্ষার মানের ক্রমাবনতি এবং বিশ্বায়নের প্রয়োজনে সাড়া দিয়ে শিক্ষা পাঠ্যসূচির আমূল আধুনিকায়নের ওপরও জোর দেয়া হয়েছে। তবে আই-পিআরএসপিতে শিক্ষাখাতের দুর্বলতা ও এসব সমাধানে যেসব সুপারিশ করা হয়েছে তা একাধারে অসম্পন্ন এবং ক্ষেত্র বিশেষে অস্পষ্ট। আর এই দুর্বলতার বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে পূর্ণাঙ্গ পিআরএসপি তৈরির জন্য শিক্ষা বিষয়ক থিমেটি পেপারে। ইতিমধ্যে শিক্ষাসহ অন্যান্য বিষয়ের থিমেটিক পেপারগুলো পরিকল্পনা কমিশনে জমা পড়েছে। সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ এই থিমেটিক পেপারগুলোর সারসংক্ষেপ তৈরির কাজ করছে। শিক্ষা বিষয়ক থিমেটিক পেপারে আই-পিআরএসপিতে শিক্ষাখাত বিষয়ক যেসব দুর্বলতা ও সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত করা হয়েছে আমরা এখানে তার একটি সার উপস্থাপন করব। একই সঙ্গে সাপ্তাহিক ২০০০-এর নিজস্ব পর্যালোচনা থেকে যেসব ত্রুটি বেড়িয়ে এসেছে তাও সংক্ষেপে বর্ণনা করা হবে।

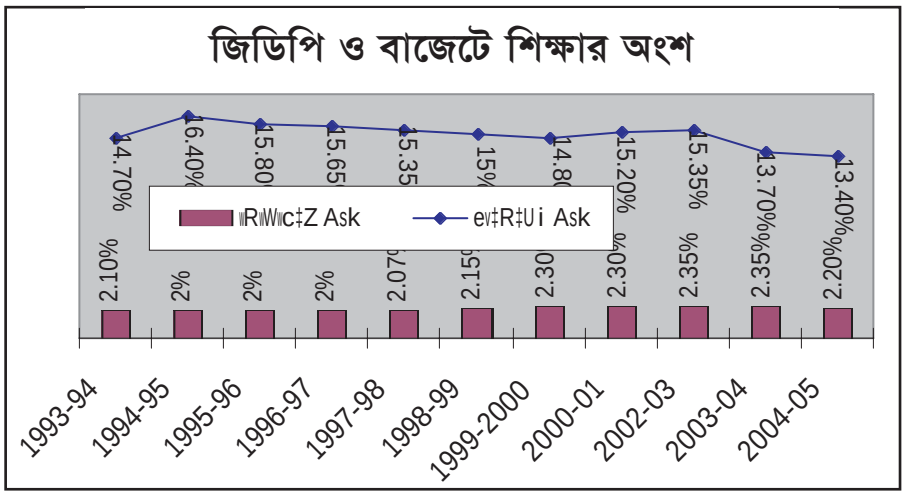

আই-পিআরএসপি দলিলকে বাজেটসহ যাবতীয় রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের মূল সূত্র হিসেবে স্বীকার করলেও কার্যত সরকার এটি যে বহুলাংশে অনুসরণ করছে না তাও পরিস্কার হয়ে যাচ্ছে এই শিক্ষাখাতের কারণে। আই-পিআরএসপিতে শিক্ষার জন্য রাষ্ট্রীয় ব্যয় বরাদ্দ বাড়ানোর কথা বলা হলেও বাস্তবে তা হচ্ছে না

প্রথমত, আই-পিআরএসপি পলিসি ম্যাট্রিক্স বা নীতি-সারণীতে শিক্ষাখাত সম্পর্কে যা বলা হয়েছে সেখানে মূলত ইতিমধ্যে যেসব কৌশল বা কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে বা হবে সেগুলোরই খন্ডিত প্রতিফলন হয়েছে। বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষিতে মধ্য মেয়াদী কৌশল ও অগ্রাধিকার সম্পর্কে কোনো সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গী নেই। আই-পিআরএসপি দলিলে শিক্ষাখাতের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের জন্য জন্য চারটি ব্যাপকভিত্তিক লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। এগুলো হলো: (ক) শিক্ষার গুণগত মান; (খ) নারী শিক্ষা; (গ) পেশাগত প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা; এবং (ঘ) বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষা। কিন্তু এ বিষয়গুলোর পর্যাপ্ত কোনো ব্যাখ্যা না দিয়ে শুধু 'কী করা হয়েছে' ও 'কী করা হবে' এগুলো বলা হয়েছে। সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট না হওয়ায় এসব লক্ষ্য অর্জন কিভাবে সম্ভব হবে বা কিভাবে কাজ করতে হবে তারও কোনো দিক নির্দেশনা পাওয়া যায় না। লক্ষ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে স্বল্পমেয়াদে বা মধ্যমেয়াদে কী করণী হবে তারও কোনো উল্লেখ নেই। কী করা হয়েছে বা হবের মধ্যে শুধু লক্ষ্য অর্জনের একটি অস্পষ্ট দিকনির্দেশনা থাকলেও এগুলো সমন্বিতভাবে কোনো সুনির্দিষ্ট কৌশল নির্দেশ করে না।

দ্বিতীয়ত, আই-পিআরএসপি দলিলে 'কী করা হয়েছে' শিরোনামের আওতায় ১০টি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু যা উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলো লক্ষ্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত হলেও সবক্ষেত্রে এসব লক্ষ্য থেকে উৎসরিত নয়। যেমন প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে মানসম্পন্ন শিক্ষকের কথাই বোঝানো হয়েছে। কিন্তু এটা করতে হলে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনা বন্ধ করতে হবে সে বিষয়ে যেমন স্পষ্ট কিছু নেই, তেমনি কিভাবে এটা সম্ভব তারও উল্লেখ নেই। উচ্চ শিক্ষার বিষয়ে যা বলা হয়েছে তা আসলে বাস্তবায়ন পক্রিয়ার চেয়ে পরিকল্পনা দিকেই বেশি জোর দিয়েছে।

তৃতীয়ত, 'কী করা হবে' এ শিরোনামের আওতায় মধ্য মেয়াদে মানে ২০০৩-০৬ সময়কালের মধ্যে ১২টি করণীয় চিহ্নিত করা হয়েছে। এর মধ্যে ৬টি ২০০৩-০৪ অর্থবছরের মধ্যে সম্পন্ন করার কথা। তবে, যেভাবে বল হয়েছে, তাতে শুধু ইচ্ছে বা প্রত্যাশারই প্রতিফলন ঘটেছে। যেমন, গরীবদের শিক্ষা প্রাপ্তির সুযোগ বাড়াতে সামাজিক নীতিসমূহ বাস্তবায়নের কথা বলা হয়েছে। সামাজিক নীতিসমূহ বাস্তবায়ন একটি বড় পরিধির বিষয়। ফলে, এখানে একধরনের সীমাবদ্ধতা রয়েই যাচ্ছে। একইভাবে 'শিক্ষা বাজেট বাড়ানোর প্রত্যাশা' করা হয়েছে। অথচ বাস্তবে ঘটেছে উল্টোটা। ২০০৩-০৪ অর্থবছরে বাজেটে শিক্ষাখাতের প্রকৃত বরাদ্দ ২০০২-০৩ অর্থবছরের তুলনায় কমে গেছে। ২০০৩-০৪ অর্থবছরে শিক্ষাখাতে রাজস্ব ও উন্নয়ন ব্যয় মিলিয়ে সমন্বিত বরাদ্দর হার ছিল মোট জাতীয় বাজেটের ১৩.৭১%। অথচ তার আগের বছর এই হার ছিল ১৫.৩৪%। এই যদি হয় অবস্থা, তাহলে আর দারিদ্র্য হ্রাসের কৌশলপত্রের গুরুত্ব রইল কোথায়? উল্লিখিত সময়ে প্রাথমিক শিক্ষখাতে বাজেট বরাদ্দও মোট শিক্ষা বাজেটের অংশ হিসেবে কমে গেছে। ২০০৩-০৪ অর্থবছরে মোট শিক্ষা বাজেটের ৪৫.৫% ছিল প্রাথমিক শিক্ষখাতে। আর ২০০৩-০৪ অর্থবছরে এই হার নেমে আসে ৪০%-এ।

চতুর্থত, শিক্ষার সঙ্গে দারিদ্র্যের প্রত্যক্ষ সংযোগ এবং দারিদ্র্য হ্রাসে শিক্ষাখাত কিভাবে ভূমিকা রাখবে তার কোনো সুস্পষ্ট নির্দেশনা আই-পিআরএসপি দলিলে মেলেনি। যেসব গৃহীত পদক্ষেপের বা পদক্ষেপ গ্রহণের কথা বলা হয়েছে, তার অনেকগুলোই দারিদ্র্য হ্রাসের বিষয়ে সরাসরি কোনো ভূমিকা রাখতে সক্ষম নয়। অন্যদিকে কিছু প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ আই-পিআরএসপি দলিলে স্থান পায়নি। যেমন, প্রাথমিক স্তরে ভর্তি ও বিদ্যালয়ে নিয়মিত উপস্থিতিতে প্রণোদনা যোগাতে গরীব শিশুদেরকে খাদ্য ও পরবর্তীতে নগদ অর্থ প্রদানের বিষয়টি।

একইভাবে উল্লেখ নেই সাক্ষরতা অভিযান চালানোর, যদিও বর্তমানে এটি আর চলছে না।

পঞ্চমত, আনুষ্ঠানিকভাবে আই-পিআরএসপি দলিলকে বাজেটসহ যাবতীয় রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের মূল সূত্র হিসেবে স্বীকার করলেও কার্যত সরকার এটি যে বহুলাংশে অনুসরণ করছে না তাও পরিস্কার হয়ে যাচ্ছে এই শিক্ষাখাতের কারণে। আই-পিআরএসপিতে শিক্ষার জন্য রাষ্ট্রীয় ব্যয় বরাদ্দ বাড়ানোর কথা বলা হলেও বাস্তবে তা হচ্ছে না। অবশ্য ২০০৪-০৫ অর্থবছরের বাজেটে শিক্ষা বঞ্চিত শিশুদেরকে স্কুলে পৌঁছানোর জন্য ৪০০ কোটি টাকার একটি প্রকল্প নেয়া হয়েছে। একই সঙ্গে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষাবৃত্তিভোগীর সংখ্যা ৩৫ হাজার থেকে ৭৭ হাজারে উন্নীত করা হয়েছে। কিন্তু, শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টির বিষয়ে কিছু বলা হয়নি। আর কর্মসংস্থান সৃষ্টি না হলে দারিদ্র্য হ্রাস করা সম্ভব হবে না তাতো স্পষ্টই।

শিক্ষায় রাষ্ট্রীয় ব্যয়

প্রতি বছর বাজেট এলেই দাবি করা হয় যে শিক্ষাখাতে সর্বোচ্চ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। কাগজে-কলমে পুরো বিষয়টির এমনভাবে উপস্থাপন করা হয় যে তা সত্যি মনে হয়। বাস্তবে বিভিন্ন রকম হিসেবের কারসাজি করা হয়ে থাকে। বিশ্বের মধ্যে যেসব দেশ শিক্ষাখাতে সবচেয়ে কম অর্থ ব্যয় করে তাদের মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। সবচেয়ে বড় কথা হলো, বাংলাদেশের মতো দেশে জিডিপি-তে (মোট দেশজ উৎপাদন) শিক্ষার অংশ যতোখানি হওয়া উচিত তা হয় না। সাধারণত জিডিপির কমপক্ষে ৫% শিক্ষার অংশ হওয়া দরকার বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। কিন্তু বাংলাদেশে এই হার ৩%-এর কম। গত এক দশকের প্রবণতা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে জিডিপিতে শিক্ষাখাতের অংশ ২% থেকে ২.৫%-এর মধ্যে ওঠানামা করেছে। সর্বশেষ ২০০৩-০৪ অর্থবছরে এই হার ছিল ২.৩৪%। এই অর্থবছরে বাংলাদেশের জিডিপির পরিমাণ হয়েছে ৩ লাখ ৩২ হাজার ৫৭০ কোটি টাকা যেখানে শিক্ষা জিডিপির পরিমাণ ছিল মাত্র ৭,৭৬৬ কোটি টাকা। গবেষণা সংস্থা উন্নয়ন অন্বেষণ আরো এ বিষয়ে বিস্তারিত পর্যালোচনা করে আরো শিক্ষখাতে রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের বিভিন্ন দিক নিয়ে হালনাগাদ একটি সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ করেছে। সেখান থেকে জানা যায়, এইভাবে শিক্ষায় রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের অংশ জিডিপির অনুপাতে হিসেব করলে একই রকম নিম্নহারই দেখতে পাওয়া যায়। গত অর্থবছরে শিক্ষাখাতে রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ৬,৫৭৫ কোটি টাকা। ফলে জিডিপির মাত্র ২% রাষ্ট্রীয়ভাবে শিক্ষখাতে ব্যয় করা হয়েছে। বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ প্রফেসর মোজাফফর আহমদ এ প্রসঙ্গে বলেন, 'বাজটে শিক্ষা খাতে শতাংশ হিসেবে তেমন কোনো উচ্চ বিবেচনা নেই। যা আছে তা কেবল বেতনভাতা ও ইট-সিমেন্টের জন্য বরাদ্দ। এর বিপরীতে প্রতিরক্ষা খাতে বরাদ্দ প্রতিবারের মতোই বেশি এবং প্রতিবারের মতো সংশোধিত খাতেও এটা তুলনামূলকভাবে বেড়েছে।' তিনি আরো বলেন, 'প্রাথমিক শিক্ষা ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জন্য উন্নয়ন ব্যয় বরাদ্দ দর্শনীয়ভাবে বেড়েছে, কিন্তু মাধ্যমিক শিক্ষা, উচ্চশিক্ষা, কারিগরি শিক্ষার ক্ষেত্রে মানবসম্পদ সৃষ্টির দৃঢ় প্রতিজ্ঞা প্রতিফলিত হয়নি।'

শুধু পরিমাণগতভাবেই ব্যয় বরাদ্দ কম নয়, বরং যা ব্যয় হয় তার একটা বড় অংশ ঠিকমতো ব্যয় করা হয় না। যেমন প্রাথমিক শিক্ষাখাতে ব্যয় হওয়া অর্থের প্রায় পুরোটাই পুরোটাই যায় শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের বেতন

আই-পিআরএসপিতে শিক্ষাক্ষেত্রের যেসব দুর্বলতা চিহ্নিত করা হয়েছে সেগুলো হলো:

- পল্লী এলাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকদের অনুপস্থিতি;
- প্রাথমিক স্তরে ভর্তির জন্য লুক্কাতি ব্যয়;
- শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত মেয়েদের বৃত্তি কর্মসূচিতে অপচয়;
- নিম্নমানের শিক্ষা;
- গৃহশিক্ষকের জন্য ক্রমবর্ধমান খরচ;
- মানসম্পন্ন শিক্ষকএবং শিক্ষা সরঞ্জামের অপর্যাপ্ততা;
- পল্লী ও নগর উভয় এলাকায় ধনী এবং দরিদ্রদের জন্য 'শিক্ষা বিভক্তি'র স্বীকৃতি;
- ছেলে-মেয়েদের গুণগত মানসম্পন্ন শিক্ষা প্রদানে দরিদ্রদের অক্ষমতা;
- স্কুল পরিচালনা কমিটিগুলোর অযথাযথ কার্যকলাপ।

আই-পিআরএসপিতে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরের দুর্বলতাগুলো দূর করতে যেসব সুপারিশ রাখা হয়েছে সেগুলো হলো:

- অভিন্ন পাঠ্যসূচি প্রবর্তন;
- শিক্ষকদের সাথে ছাত্রের সান্নিধ্যের সময় বৃদ্ধি;
- ছাত্র/শ্রেণীকক্ষ অনুপাত হ্রাস;
- প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বিজ্ঞান, গণিত এবং ইংরেজি ভাষা শিক্ষকের সংখ্যা বৃদ্ধি;
- সময়ে সময়ে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান ও তাদের মান পরিদর্শন;
- পর্যাপ্ত বিজ্ঞানাগার সুবিধা প্রদান;
- খেলা মাঠের সুবিধা প্রদান;
- শিক্ষা-বহির্ভুত কার্যক্রম পরিচালনা;
- অভিভাবক ও স্থানীয় কমিউনিটির নিকট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জবাবদিহিতা;
- এ-খাতে অধিক অর্থ বরাদ্দ;
- খাদ্যভিত্তিক সহায়তার কার্যক্রমের পরিবর্তে নগদ অর্থ প্রদান;
- জরুরি অবস্থায় ও অত্যন্ত দারিদ্র্যপীড়িত এলাকায় খাদ্য বিতরণ।

গবেষণা সংস্থা উন্নয়ন অন্বেষণ আরো এ বিষয়ে বিস্তারিত পর্যালোচনা করে আরো শিক্ষখাতে রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের বিভিন্ন দিক নিয়ে হালনাগাদ একটি সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ করেছে। সেখান থেকে জানা যায়, এইভাবে শিক্ষায় রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের অংশ জিডিপির অনুপাতে হিসেব করলে একই রকম নিম্নহারই দেখতে পাওয়া যায়

দিতে। আবার বেতন হার এতো নিম্ন যে তার বিনিময়ে ভাল ফল আশা করা নিতান্তই বাতুলতা। আবার দেশে বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা বজায় থাকায় এবং সরকারি বিদ্যালয়, বেসরকারি বিদ্যালয়, মাদ্রাসা, ক্যাডেট কলেজ প্রভৃতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কারণে প্রতিষ্ঠান থেকে প্রতিষ্ঠানে প্রাথমিক শিক্ষাখাতের মাথাপিছু ব্যয় বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। যেমন, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মাথাপিছু ব্যয় যেখানে ১ হাজার টাকারও কম সেখানে ক্যাডেট কলেজে এই ব্যয় ৫০ হাজার টাকার বেশি।

সবশেষ ২০০৪-০৫ অর্থবছরের বাজেটে শিক্ষখাতে ৭,৬৮০ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ দেয়া হয়েছে যা আগের অর্থ বছরের চেয়ে প্রায় ১৪% বেশি। কিন্তু টাকার অংকে বরাদ্দ বাড়লেও মোট বাজেটে শিক্ষার অংশ কিন্ত কমেই চলেছে। আলোচ্য অর্থ বছরে শিক্ষাখাতের দেয়া ব্যয় বরাদ্দ মোট বাজেটের ১৩.৪% যা কিনা আগের বছরের চেয়েও কম। বাজেট বরাদ্দ কম হওয়াতো একটা দিক। আর এই বরাদ্দকৃত অর্থ যথাযথভাবে ব্যবহৃত না হওয়া আরেকটা বড় সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে গত কয়েক বছর ধরে। টাকার প্রয়োজন আছে, টাকাও আছে, অথচ টাকা খরচ করা যাচ্ছে না– এমন পরিস্থিতি বোধহয় বাংলাদেশেই সম্ভব। যেমন ২০০৩-০৪ অর্থ বছরের শিক্ষাখাতের জন্য বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির ১১.৭% বরাদ্দ দেয়া হয়েছিল। বরাদ্দ হিসেবে শিক্ষাখাতের অবস্থান ছিল চতুর্থ। অথচ অর্থবছরের নয়মাসে মানে মার্চ পর্যন্ত এই বরাদ্দের মাত্র ৫৬% ব্যয় হয়েছে। নিশ্চই বাকী তিনমাসে ৪৪% ব্যয় হয়নি বা হতে পারে না। তার মানে হলো, সরকারি ব্যয় প্রক্রিয়ায় এমন কিছু জটিলতা রয়েছে যা বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করছে। সরকারের এব্যাপারে বিশেষ মনোযোগ দেয়া প্রয়োজন। চলতি অর্থবছরের উন্নয়ন ব্যয়ে শিক্ষাখাতের অবস্থান চতুর্থ। টাকা পরিমাণে ব্যয় বরাদ্দ বেড়ে হয়েছে ৩,১৫৩ কোটি টাকা যা এডিপির ১৪%।

শিক্ষায় রাষ্ট্রীয় ব্যয় পরিস্থিতি পর্যালোচনায় আমরা দুটো প্রধান চ্যালেঞ্জ দেখতে পাচ্ছি। একটি হলো: ব্যয় বরাদ্দ। অপরটি হলো: বরাদ্দকৃত অর্থের সদ্ব্যবহার। দারিদ্র্য হ্রাসে শিক্ষার সুদূরপ্রসারী ভূমিকাকে কার্যকর করতে হলে একদিক শিক্ষাব্যয় বাড়াতে হবে, অপরদিকে এই ব্যয় যেন সদ্ব্যবহার হয় সেটি নিশ্চিত করতে হবে। এর মাঝামাঝি কোনো পথ নেই।

প্রতিবেদনটি সাপ্তাহিক ২০০০ ও এ্যাকশনএইড বাংলাদেশের একটি যৌথ উদ্যোগ